ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 656-663
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.255

ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথের ছন্দ চিন্তা এবং বাংলা ছন্দে তাঁর অবদান

সুমন মোদক, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়, হোজাই, অসম, ভারতবর্ষ*

Received: 25.12.2025; Accepted: 28.12.2025; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Our discussion highlights a vital aspect of Rabindranath Tagore's poetic vision: his deep exploration of rhythmic thought. Tagore placed great importance on traditional meters, diving deep into their inner structures to understand how they work. Throughout his writing, he not only analyzed these rhythms but also identified and named various types of meters, which are explored in this article.

One of Tagore's most significant contributions was his transformations of the Dalbritta meter. Before him, this rhythm was often dismissed as a style suited only for nursery rhymes, folk chants, or light humour. Tagore changed the perception, proving that it could carry the weight of serious and profound poetry. Like a river carving a new path, he broke through the rigid structures of Bengali verse and reshaped them into something entirely new. While he is not traditionally called the inventor of Bengali meter, it was through his artistry that it reached its most refined and meaningful form. Along with that, Tagore was a pioneer and a master artist of prose rhythms, showing that even prose could possess a musical soul.

Keywords: Rabindranath, Meters, Rhythms, Prose rhythms, Bengali poetry, Verse

বিশ্বব্যাপী বঙ্গ সংস্কৃতি তথা সাহিত্যের যে চিরন্তন চর্চা তার মূলে যাঁর সার্বভৌম অবদান তিনিই আমাদের প্রিয় রবি ঠাকুর। তিনি কাব্য, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, গান প্রভৃতি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শুধু যে নিজেকে বিশ্বের প্রথম সারিতে বসিয়েছেন তা নয়, বাঙালি জাতি তথা বাংলা ভাষাকেও শ্রেষ্ঠত্বের মহিমায় মহিমান্বিত করেছেন। আসলে কবিসত্তা যে বাঙালির সহজাত তা বিশ্ববাসীর অন্তরে চিরন্তনত্ব প্রদান, তাঁর কীর্তিই বলা চলে। এহেন মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অতি সক্রিয়তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তিনি তাঁর কাব্যসম্ভারের মধ্য দিয়ে এম্‌নি এম্‌নি 'কবিগুরু' বা 'বিশ্বকবি' হয়ে ওঠেননি। তার পিছনে ছিল তাঁর নিরলস সৃষ্টি উদ্যম, সৌন্দর্যবোধ, সার্বিক দৃষ্টি, সর্বোপরি সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার অকৃত্রিম অপরিমেয় ভালবাসা। তাঁর শুভজন্মের 'সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপনের পরও তাঁকে নিয়, তাঁর কাব্যসম্ভার নিয়ে আজও নানান চর্চা চলছে। যদিও তা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের লক্ষ্য ঐ সমস্ত কাব্যসম্ভার সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি কিভাবে চোখ কান খোলা রেখেছেন এবং সৃষ্টির আনন্দে মেতে সেইসব রচনাকে নানাভাবে তরঙ্গায়িত করেছেন তাকেই স্মরণ করে নেওয়া। তাঁর চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদেরকে সূক্ষ্মাতিমুখী করে তুলতে বীজ বপন করা। কাব্যের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে 'ছন্দ'-কে তিনি কিভাবে ব্যবহার করেছেন, বাংলা ছন্দ প্রসঙ্গে নানা চিন্তনের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন -

তাও আমরা আলোচনা করবো। এককথায় রবীন্দ্রনাথের ছন্দ চিন্তার পর্যালোচনা আমাদের আলোচ্য বিষয়। যার মাধ্যমে সহজেই প্রকাশিত হয় বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের অবদান, তারও প্রকাশ ঘটানো আমাদের উদ্দেশ্য।

১

ছন্দ হল শব্দের শিল্পময় বিন্যাস, যা ভাষার চলনভঙ্গিকে অবলম্বন করে বিশেষভাবে বিন্যস্ত হয় এবং উচ্চারণে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি করে এবং পরিণামে চিত্তে জাগায় আনন্দানুভূতি। আসলে যা কিছু ছন্দোময় সে সমস্তই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কাব্যে ছন্দের প্রয়োগ যদি আদি অনন্তকাল ধরে তাই হয়তো সাধারণভাবে চলে আসছে। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি এবং ছান্দসিক। স্রষ্টা হিসাবে তিনি ছন্দের তাজমহল নির্মাণ করেছেন। অন্যদিকে ছান্দসিক হিসাবে বাংলা ছন্দের বিশিষ্টতা সম্পর্কে আলোকপাত করে সুনির্দিষ্ট পথনির্মাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর এই দুই রূপ একে অপরের পরিপূরক। এবারে আমরা দেখে নিতে চাইবো রবীন্দ্রনাথ ছন্দ বলতে কী বুঝতেন। তিনি 'ছন্দ' গ্রন্থে ছন্দ প্রসঙ্গে বলেছেন- "ভাষার উচ্চারণ অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়।"[১] তিনি ঐ গ্রন্থে আরও বলেছেন- "প্রত্যেক ভাষারই একটি স্বাভাবিক চলিবার ভঙ্গি আছে সেই ভঙ্গিটারই অনুসরণ করিয়া সেই ভাষার নৃত্য অর্থাৎ তাহার ছন্দ রচনা করিতে হয়।"[২]

বাঙালির চিরন্তন কোমল স্বভাবের ন্যায় বাংলা শব্দ উচ্চারণের মধ্যে ঝোঁক গাম্ভীর্য প্রায় নেই। সেইজন্য আমাদের কোনো লেখা অত্যুক্তি-পুনরক্তি বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও আড়ম্বরপূর্ণ না করলে পাঠক মনে তেমন সাড়া দেয় না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আলোচনায় মধুসূদনের মহাকাব্যের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গাম্ভীর্য শব্দই কাব্যের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলে তেমন নয়। উপযুক্ত শব্দের অভাবে কাব্যের রস বিনষ্ট হয়। আসলে তিনি দেখাতে চেয়েছেন ছন্দ হচ্ছে বিশেষ বিধি নিয়ন্ত্রিত বিরামময় পদ্ধতি। আবৃত্তি যার মাধ্যমে সুখপাঠ্য ও সুখশ্রাব্য হয়ে ওঠে এবং পরিণামে চিত্তে জাগায় আনন্দানুভূতি অর্থাৎ পরিশেষে রস সঞ্চারিত হতে বিশেষ সাহায্য করে।

২

কাব্যে ছন্দের প্রয়োজনীয়তা তথা প্রাসঙ্গিকতা কী তা রবীন্দ্র কাব্য সম্ভারের দিকে লক্ষ্য করলেই পরিস্ফুট হবে। আসলে রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র ছান্দসিক নন, তিনি মূলত স্রষ্টা তথা শিল্পী। শিল্পীর পক্ষে সর্বদা শিল্প ও ব্যাকরণকে এক লাইনে রাখা অসম্ভব। কখনো কখনো শিল্পত্বের খাতিরে ব্যাকরণকে মাথা নোয়াতে হয়। তাই এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন- "যারা ছান্দসিক তাদের উপর এই কাটাছেঁড়ার ভার দাও, তুমি যদি ছন্দরসিক হও তবে ছুরিকাঁচি ফেলে দিয়ে কানের পথ খোলসা রাখ যেখান দিয়ে বাঁশি মরমে প্রবেশ করে।"[৩] এই বক্তব্যে সুস্পষ্ট কাব্যে ছন্দের প্রয়োজনীয়তা মূলত কানের তৃপ্তি ঘটানো এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কাব্যরস মরমে পৌঁছানোর উপযোগী করে তোলা। আসলে ভাষায় যে শব্দগুলি শুধু অর্থবহন করে সেগুলিই কাব্যে তথা কবিতায় ছন্দের দ্বারা বিশেষ রূপগ্রহণ করে। বস্তুত যা কিছু সাধারণ, জীর্ণ, মলিন তাই যেন কাব্যে সাহিত্যে ছন্দের দোলায় প্রাণবন্ত ও রঙিন হয়ে ওঠে,পার করে তার ব্যাচার্থ, পাড়ি দেয় ভাবের অতলে, আমরা হই রস সমুদ্রে নিমজ্জিত। কবির ভাবনায় তারই প্রকাশ-

১. "মানবের জীর্ণবাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে।" – ('ভাষা ও ছন্দ'- 'কাহিনী')

অতএব বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ কাব্যোৎকর্ষে ছন্দের অবদানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সেইজন্য তিনি গদ্যছন্দকে কখনো কখনো কাব্যের বাহন করলেও প্রথাগত ছন্দকে ও তার প্রয়োজনীয়তাকে কোনদিন অস্বীকার করেননি।

৩

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দের নানা কাটাছেঁড়া, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ব্যবহার করে ক্ষান্ত থাকেননি বরং নানান নামে সেগুলিকে অভিহিত করেছেন, এইসব ছন্দের নিজস্ব নামকরণ তথা পরিভাষা প্রদান করেছেন। প্রকৃতি বিচারে বাংলা ছন্দে মূলত তিনটি রীতি প্রচলিত। বিভিন্ন ছান্দসিক, কবি, সমালোচক প্রমুখ অজস্র ব্যক্তি তাঁদের নানা দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন এবং সেইরূপে ছন্দের নামকরণ করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথও এই তিন রীতির ছন্দের নামকরণ করেছেন। যদিও তাঁর নামকরণে ব্যাকরণগত বা বৈজ্ঞানিক নীতি সম্মত ত্রুটি আছে বলে অনেকে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন-এর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে- "রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের দেওয়া নামগুলি ছন্দের উৎস বা গুণ পরিচায়ক, ছন্দের গঠন প্রকৃতির পরিচায়ক নয়।[৩] তবু আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রকৃত নামকরণ একেবারে ফেলে দেওয়ার মত নয়।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দের তিন রীতিরই আলাদা আলাদা নামকরণ করেছেন। দলবৃত্ত ছন্দকে তিনি বলেছেন 'বাংলা প্রাকৃত ছন্দ'। কলাবৃত্ত ছন্দকে তিনি 'সাধু নূতন' এবং মিশ্রবৃত্তকে 'সাধু পুরাতন' ছন্দ বলে উল্লেখ করেছেন। আসলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন বাংলা ছন্দ রচনার দুই রীতি- 'সাধু' ও 'প্রাকৃত'। আমরা যাকে 'দলবৃত্ত' রীতি বলি তাকে তিনি 'প্রাকৃত' রীতি বলতেন। অন্যদিকে আমরা যাকে বলি 'কলাবৃত্ত' তাকে তিনি সাধু রীতিরই প্রকারভেদ হিসাবে গণ্য করতেন। এছাড়াও তিনি ঐ তিন রীতির ছন্দ বোঝানোর জন্য কখনো কখনো আরো একাধিক পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। লোকসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে দলবৃত্ত ছন্দকে বলেছেন 'অসংস্কৃত অমার্জিত ভাঙাচোরা' ছন্দ; আবার কখনো একে 'ছড়ার ছন্দ'ও বলেছেন। কখনো আবার কলাবৃত্ত ছন্দকে 'সংস্কৃতভাঙা' এবং মিশ্রবৃত্ত ছন্দকে 'পয়ার জাতীয় ছন্দ', 'সাধু বাংলার ছন্দ' বলে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে স্বপ্রচলিত 'গদ্য ছন্দ'-কে বলেছেন 'ভাবের ছন্দ'। গদ্য কবিতার ভাষাকে বলেছেন 'গৃহস্থ পাড়ার ভাষা'।

রবীন্দ্রনাথ এই তিন রীতির নামকরণ ছাড়াও ছন্দ আনুষঙ্গিক বহু বিষয়ের নামকরণ করেছেন। 'পয়ার' ও 'মহাপয়ার' বাংলা কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন। রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় তা হয়েছে 'ইন্দ্রের উচ্চৈশ্রবা ও ঐরাবত'। তিনি বাংলা মুক্তক ছন্দকে বলেছেন 'গণ্ডিভাঙা', 'বেড়াভাঙা' পয়ার; কখনো আবার 'হৃদয়ের ছন্দ' কখনো 'লাগাম ছাড়া' ইত্যাদি নানা অভিধা প্রদান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'পূর্ণযতিহীন ছন্দ' অর্থাৎ 'পঙক্তি যতিলঙ্ঘক' ছন্দকে বলেছেন 'পঙ্ক্তিলঙ্ঘক ছন্দ'। আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'প্রবাহমান ছন্দ'। রবীন্দ্রনাথের এই সব নামকরণ অনেক সময় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ একই পরিভাষা তিনি কোথাও কোথাও ভিন্নার্থক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্র প্রদত্ত এই ছন্দ সংক্রান্ত সমস্ত পরিভাষার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তা যেমন ছন্দের উৎস নির্দেশক তেমনি কাব্যিক ব্যঞ্জনাময়।

৪

সাধারণভাবে দলবৃত্ত ছন্দ বলতে বুঝি- বাংলা ছন্দের যে বিশেষ রীতিতে ধ্বনি পরিমিত হয় দলসংখ্যার হিসাবে অর্থাৎ যে ছন্দোরীতিতে দলই ছন্দের মাত্রা হিসাবে নিরূপিত হয়, তাই দলবৃত্ত ছন্দ। ব্যাপকভাবে বলা যায় প্রতি পর্বের আদ্যাক্ষরে শ্বাসাঘাতযুক্ত দ্রুত লয়াশ্রিত, সাধারণত চার মাত্রার পূর্ণপর্বে গঠিত, উভয় দলই একমাত্রা হিসাবে বিবেচিত সুপ্রাচীন লৌকিক ছন্দকে বলে দলবৃত্ত ছন্দ। এবারে আমরা এই ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ বোঝার চেষ্টা করবো।

প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব দক্ষতায় যেভাবে দলবৃত্ত ছন্দের উত্তরণ ঘটিয়েছেন তা বিস্ময়ের ব্যাপার। রবীন্দ্র পূর্বকালে ছেলেভুলানো পদ্য, তন্ত্র-মন্ত্র, খনার বচন, হাস্কাহাসি, ব্যঙ্গ কবিতা, হালকা সুরের কবিতা, সর্বোপরি আপাত তুচ্ছ বিষয় ছিল মূলত দলবৃত্ত ছন্দের বাহন। রবীন্দ্রনাথও প্রথম জীবনে তুচ্ছ বিষয়ে এ ছন্দ ব্যবহার করেছেন। তবে লক্ষ্য করলে রবীন্দ্র রচনার আদি পর্বেই এরূপ কবিতার দৃষ্টান্ত লক্ষ্যণীয়। 'কথা ও কাহিনী'র 'নকলগড়' ও 'হোরিখেলা' এবং 'কল্পনা' কাব্যের 'হতভাগ্যের গান' প্রভৃতি কবিতা উল্লেখযোগ্য। তবে 'খেয়া'(১৯০৫-০৬) কাব্য রচনার সময় থেকেই দলবৃত্ত ছন্দ পাকাপাকি ভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে।

দলবৃত্ত ছন্দের বিশেষ ভারবহন ক্ষমতা আছে, রবীন্দ্রনাথ তা স্বরচিত কাব্যের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন তাই কুর্নিশ জানিয়ে বলেছেন-

> "রবীন্দ্রনাথ এই দলবৃত্ত ছন্দের স্রষ্টা নন। তাঁর কৃতিত্ব এই যে, তিনিই প্রথম লোকসাহিত্যের বাহন স্থানীয় এই খাঁটি বাংলা ছন্দটিকে বহুকালের অবজ্ঞা ও তুচ্ছতা থেকে উদ্ধার করে তাকে নিঃসংকোচে সর্বপ্রকার লোকসাহিত্যের বাহন হবার উপযুক্ত মর্যাদা ও আভিজাত্য দান করেছেন এবং এটিকে যথোচিতরূপে মার্জিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করে তথা বহু শাখা-প্রশাখায় পরিবর্ধিত ও অলংকৃত করে বাংলার ছন্দ ভাণ্ডারকে পূর্ণ করে তুলেছেন।"[৪]

সর্বোপরি বলা যায় রবীন্দ্রনাথ দলবৃত্ত ছন্দের যে উত্তরণ ঘটিয়েছেন তা তাঁর অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর। যার জন্য পরবর্তী কবিগণ তাঁর কাছে বিশেষ ঋণী। আসলে রবীন্দ্রনাথ দলবৃত্ত ছন্দের ভারবহন ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন, প্রসারিত করেছেন তার ক্ষেত্রকে। ফলস্বরূপ এই ছন্দ আজ নতুন নতুন ভাবের মায়ালোক সৃষ্টি করে চলেছে।

৫

এবারে আমরা আসবো কলাবৃত্ত ছন্দ সম্পর্কে। আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন কলাবৃত্ত ছন্দের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে- "যে রীতিতে বাংলা ছন্দের ধ্বনি পরিমিত হয় কলাসংখ্যার হিসাবে তাকে বলা হয় কলাবৃত্ত ছন্দ। ভাষান্তরে বলা যায়, যে ছন্দোরীতিতে কলাই ছন্দের মাত্রা বলে গণ্য হয় (অর্থাৎ এক কলাকে একমাত্রা বলে গণ্য হয়) তার নাম কলাবৃত্ত।"[৫] আসলে যে বাংলা ছন্দোরীতি বিলম্বিত লয়াশ্রিত(মধ্যম), ধ্বনিঝঙ্কার যুক্ত, সাধারণত ৫/৬/৭ মাত্রার পূর্ণপর্বে গঠিত, যার রুদ্ধ অক্ষর মাত্রই দুই মাত্রা তাকে কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে।

সৃষ্টির পূর্বে স্রষ্টার মনে-প্রাণে, দেহে গর্ভযন্ত্রণা অনুভূত হয়, এগোতে হয় অতি সাবধানে। তেমনি কবি রবীন্দ্রনাথকেও সে যন্ত্রণা বইতে হয়েছে। কারণ রবীন্দ্রনাথই বাংলা ছন্দোরীতিতে 'কলাবৃত্ত' রীতির প্রতিষ্ঠাতা। এ প্রসঙ্গে প্রবোধবাবুর মন্তব্য যুক্তিযুক্ত- " 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 'ছবি ও গান' রচনার কালটাকে (১৮৮১-৮৪) এবং আংশিকভাবে 'কড়ি ও কোমল' রচনার সময়টাকেও (১৮৮৫-৮৬) ছন্দ ব্যাকুলতা ও নিয়মভাঙার যুগ বলে অভিহিত করতে পারি।"[৬] তারপর 'মানসী' কাব্য রচনা কালে কবির সঙ্গে যোগ দিলেন একজন শিল্পী। সব মিলিয়ে 'মানসী' কাব্যে প্রবর্তিত হলো নতুন ছন্দোরীতি -যার রবীন্দ্র প্রবর্তিত নাম 'সাধু নূতন ছন্দ' অর্থাৎ সর্বজনগ্রাহ্য 'কলাবৃত্ত' ছন্দ। তিনি দেখালেন অক্ষর সংখ্যা নয় 'কলা'ই ছন্দের প্রাণ। প্রতি এক কলাকে এক মাত্রা ধরা হলো। প্রকাশ পেল নতুন বাংলা ছন্দ। সেদিক দিয়ে 'মানসী' কাব্যের বিশেষ গুরুত্ব আছে। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দিলে আমাদের দেওয়া বক্তব্য আরও সুস্পষ্ট হবে-

"তোমারে কহিব লজ্জাকাহিনী, লজ্জা নাহিকো তায়

তোমার আভায় মলিন লজ্জা পলকে মিলায়ে যায়।" (সুরদাসের প্রার্থনা- মানসী)

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তের দুটি চরণেই চারটি অর্থাৎ তিনটি পূর্ণ একটি অপূর্ণ পর্ব বর্তমান। প্রতি পূর্ণ পর্বে ছয়টি ও অপূর্ণ পর্বে দুটি করে মাত্রা বর্তমান। অর্থাৎ প্রত্যেক রুদ্ধ দলই তার প্রসারিত উচ্চারণের জন্য দু-মাত্রার মর্যাদা পেয়েছে। যদিও ১৮৮৭ (বাংলা ১২৯৪) সালের বৈশাখ মাসে রচিত 'ভুলভাঙা' কবিতাটি প্রকৃত পক্ষে বাংলা সাহিত্যে কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে রচিত প্রথম কবিতা। নদী যেমন আপনার পথ আপনিই করে নেয়। ঠিক তেমনই রবীন্দ্রনাথও কাব্যের প্রয়োজনে বাংলা ছন্দকে ভেঙে গড়ে ব্যবহার করেছেন। এই নতুন সৃষ্টির গোপন অভীপ্সার ফলস্বরূপ তৈরী হয়েছে 'কলাবৃত্ত' ছন্দ। যার ফলে বাংলা ছন্দ ভাণ্ডার যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে তেমনি বাংলা কাব্যও হয়েছে সর্বাঙ্গ সুন্দর।

৬

এবারে আসি মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির ছন্দ সম্পর্কে। যে বাংলা ছন্দোরীতিতে শব্দান্ত রুদ্ধদল এবং একক রুদ্ধদল সর্বদা বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রকরূপে এবং শব্দের অপ্রান্ত রুদ্ধদল সাধারণত একমাত্রকরূপে উচ্চারিত হয় তাকে মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দ বলে। সদ্য বর্ষার প্রাদুর্ভাবে গাছপালা যেমন সবুজ হয়ে ওঠে, মেলে দেয় নিজেকে। ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথের দুর্বার প্রতিভায় মিশ্রবৃত্ত ছন্দও নিজেকে প্রসারিত করেছে ভাবের নানা মহিমায়। আসলে মিশ্রবৃত্ত রীতিটি কোনো ব্যক্তি বিশেষের প্রবর্তিত নয়, বহু কবির বহু ব্যবহারে বিবর্তিত হতে হতে এটি বর্তমান রূপ লাভ করেছে। তবে রবীন্দ্রনাথের হাতেই এই ছন্দের যথার্থ প্রকৃতি নিরূপিত হয়েছে। বোঝা গিয়েছে এটি আসলে একটি মিশ্র প্রকৃতির ছন্দ। তাই ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন প্রদত্ত 'মিশ্রবৃত্ত' নামটিও রবীন্দ্র ছন্দ চিন্তনের ফসল। তিনিও বলেছেন- "এটির শেষ পরিমার্জিত রূপ প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের রচনায়।"[৭]

রবীন্দ্র পূর্ববর্তীকালে এই বিশিষ্ট ছন্দোরীতির মাত্রা নিরূপিত হতো অক্ষর গণনার মাধ্যমে। তিনিই শতাধীক বৎসরের আক্ষরিক সংস্কারকে ছিন্ন করে মিশ্রবৃত্ত ছন্দকে ধ্বনিভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে- "আক্ষরিক ছন্দ বলে কোনো অদ্ভুদ পদার্থ বাংলায় কিংবা অন্য কোনো ভাষাতেই চলতে পারে না।"[৮] রবীন্দ্র রচনা থেকে একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে-

"ভালো মন্দ দুঃখ সুখ অন্ধকার আলো
মনে হয় সব নিয়ে এ ধরনী ভালো।" ('ধরাতল'- 'চৈতালী')

-দৃষ্টান্তটিতে শব্দের অন্তে অবস্থিত রুদ্ধদল আমাদের উচ্চারণে প্রসারিত হয় এবং দুই কলার মর্যাদা পায়। একদল শব্দের রুদ্ধদলও প্রসারিত উচ্চারণের জন্য শব্দান্ত হিসাবে গণ্য হয়েছে। আবার অপ্রান্ত রুদ্ধদল সঙ্কুচিতভাবে উচ্চারিত হবার জন্য এককলা পরিমিত হয়। দৃষ্টান্তটিতে 'মন্দ' শব্দের 'মন্', 'দুঃখ' শব্দের 'দুঃ' এবং অন্ধকার শব্দের 'অন্' প্রত্যেকটি এককলার সমান। মুক্তদল সাধারণভাবেই এককলা। সুতরাং এই হিসাবে দেখলে দেখা যাবে প্রতি পূর্ণ পর্বে চার কলা এবং অপূর্ণ পর্বে দুই কলা আছে। রুদ্ধদলের এই দুই রূপের একত্র সমাবেশের জন্যই এই রীতির নাম 'মিশ্রকলাবৃত্ত'। যার প্রকৃতি উদ্‌ঘাটনের জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশেষ ঋণী। মিশ্রবৃত্ত ছন্দের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যটি ছন্দের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাব্য। রবীন্দ্রনাথ তপোলব্ধ ঐশ্বর্য এ কাব্যে অসাধ্য সাধন ঘটিয়েছে। এককথায় রবীন্দ্রনাথ এ ছন্দের আবিষ্কারক না হলেও সার্থক পরিমার্জিত রূপের সর্বোত্তম স্রষ্টা।

৭

'গদ্য ছন্দ' -এর আবিষ্কারক ও সুনিপুণ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা ভাষায় গদ্য ছন্দ তথা গদ্য কবিতার প্রতিষ্ঠাতা নিঃসংশয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আবার তিনিই এখনও পর্যন্ত বাংলা ভাষায় গদ্য কবিতার শ্রেষ্ঠ রূপকার। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরাজী অনুবাদ রচনাকালে কবির মনে এক নতুন ভাবনা জাগ্রত হয়। তারপর যখন ঐ গদ্যানুবাদ ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদা পেল, তখনই কবির লেখনীর মাধ্যমে ভূমিষ্ঠ হল 'গদ্য কবিতা' বা 'গদ্য ছন্দে'র কবিতা। শুধু তাই নয়, কবির অনুসন্ধিৎসু মন গদ্য সাহিত্যের মধ্যেও খুঁজে পেয়েছে কাব্যের ধর্ম, তার রস ও স্পন্দন। তিনি বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এর অনেক রচনা এবং 'উপনিষদ'-এর গদ্য রচনাকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সত্যকাম জাবালের আখ্যায়িকা গদ্যে রচিত হলেও তার মধ্যে কাব্যের রস গভীর হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সমস্ত কাহিনী পড়ে যেমন মুগ্ধ হয়েছেন তেমনি 'গদ্য ছন্দ'এর কবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। গদ্য কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ 'ভাবের কবিতা' বলেছেন। এর ছন্দকে বলেছেন 'ভাবের ছন্দ'। তাই তিনি মনে করেন ভাবকে গুচ্ছে গুচ্ছে সাজিয়ে এ ধরনের কবিতা রচনা করতে হয়। তাছাড়া তিনি গদ্য কবিতাকে পদ্যের ঘেরাটোপ থেকে বের করবার জন্য বিশেষ সচেতন ছিলেন। পদ্যে ব্যবহৃত 'মেনে', 'তরে', 'মোর' ইত্যাদি শব্দগুলো গদ্য কবিতায় বর্জন করেছেন। শুধু তাই নয় গদ্যে ব্যবহৃত শব্দ এ ধরনের কবিতায় অধিক ব্যবহার করেছেন। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৬ -এর মধ্যে প্রকাশিত হল 'পুনশ্চ' বর্গের চারটি কাব্য 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী' -গদ্য ছন্দে লেখা। 'শেষ সপ্তক'এর ছেচল্লিশটি কবিতায় গদ্যে লেখা। অন্যদিকে 'শ্যামলী' কাব্যের কুড়িটি কবিতা এই ছন্দে লেখা। তবে 'শেষ সপ্তক'-ই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্য কবিতা গ্রন্থ। এ কাব্যের 'পঁচিশে বৈশাখ' উৎকৃষ্ট গদ্য কবিতার উদাহরণ –

"পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের ধারাকে বহন করে
মৃত্যুদিনের দিকে
সেই চলতি আসনের উপর ব'সে কোন কারিগর গাঁথছে
ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা।" ('পঁচিশে বৈশাখ'- "শেষ সপ্তক")

আসলে গদ্য কবিতার উপকরণ পদ্যের পর্ব নয়, সাধারণ গদ্যের এক একটা 'Pharse' বা 'অর্থবাচক সমষ্টি'। যদিও রবীন্দ্রনাথ এরপরে আর ধারাবাহিকভাবে গদ্যেছন্দে কাব্য লেখেননি। কারণ এই ধরনের কবিতা রচনার জন্য অসাধারণ দক্ষতার দরকার হয়। কিন্তু রবীন্দ্র সমকালীন একদল কবি গদ্য কবিতার ঢঙে কবিতা লিখতে শুরু করেন। যা না কবিতা না গদ্য। তাই হয়তো কবিতার মান রক্ষার্থে রবীন্দ্রনাথ এরূপ সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেন প্রমুখ গদ্য কবিতা রচনা করলেও রবীন্দ্রনাথই এ ধরনের কবিতার একেশ্বর রূপে বিরাজমান।

৮

সব মিলিয়ে বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ছন্দ ভাবনার প্রভাব অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ শুধু গদ্যছন্দ, কলাবৃত্ত ছন্দের স্রষ্টা কিংবা মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের বা দলবৃত্ত ছন্দের সর্বোত্তম সংস্কারকই নন, তিনি ছন্দের উৎকর্ষ ঘটিয়েছেন নানাভাবে। যেমন তিনি ছন্দ মুক্তি ঘটিয়েছেন 'মুক্তক ছন্দ' রচনার মাধ্যমে। আবার মধুসূদন অমিল প্রবাহমান পয়ার পর্যন্ত এসে থেমেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রকাশ পেল সমিল প্রবাহমান পয়ার। এককথায় রবীন্দ্রনাথ সার্বিক ভাবে বাংলা ছন্দের মুক্তি ঘটিয়েছেন, প্রসারিত করেছেন তার ক্ষেত্রকে। তাই

প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন- "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ছন্দ সমৃদ্ধির কথা বিবেচনা করলে সহজেই উপলব্ধি হবে যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলার শুধু কবিগুরুই নন, তিনি আমাদের ছন্দোগুরু বটেন।"[৯]

তাই রবীন্দ্রনাথ সমকালীন ও পরবর্তীকালের বহু প্রধান ও অপ্রধান কবিরা নির্দ্বিধায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে মেনে নিয়েছেন। রমণীমোহন ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রজনীকান্ত সেন, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবিগণ তো বটেই স্বয়ং নজরুলও কোথাও কোথাও রবীন্দ্র ছন্দের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এমনকি একালের কবিরাও রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত হয়ে কোনো বলিষ্ঠ ছন্দোরীতি প্রয়োগ করতে পারেননি। এমন সর্বগ্রাসী শক্তি রবীন্দ্রনাথ ছড়িয়ে গেছেন তা ভাবলেই বিস্মিত হতে হয়। সেজন্য রবীন্দ্রোত্তর কবিরা জ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় রবীন্দ্রনাথকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। পরিশেষে বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান অবদানকে সূত্রাকারে বললে এমন বলা যেতে পারে-

- বাংলা ছন্দের আলোচনায় 'অক্ষর' সংখ্যা গণনার অনাবশ্যকতা।
- সাধুরীতির ছন্দে শব্দান্ত রুদ্ধ দলের দীর্ঘ অর্থাৎ দ্বিমাত্রক উচ্চারণ।
- সাবেক সাধুছন্দের বিশ্লেষণে সিলেবল -এর (মাত্রার) ভূমিকা এবং এজাতীয় ছন্দের মিশ্রপ্রকৃতি স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা।
- লৌকিক ছন্দের ক্ষেত্রে সিলেবল গোনা প্রকৃতি স্বীকার।
- তিন রীতি ভেদে ত্রিবিধ পয়ারের পরোক্ষ স্বীকৃতি।
- গদ্য ছন্দের কবিতার শৈল্পিক ব্যবহার।
- অমিল মুক্তকের ব্যবহার।
- সমিল প্রবাহমান পয়ারের স্বীকৃতি।

আমরা আমাদের আলোচনায় রবীন্দ্র সৃষ্টি সম্ভারের তেমন কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিনি বরং ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রচিন্তনের পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছন্দবিষয়ক অবদানের দিকটিও ওঠে এসেছে। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য কবিতায় ছন্দকে ভেঙেচুরে ব্যবহার করেছেন, গড়েছেন নতুনভাবে। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রবন্ধ, বিভিন্ন আলোচনায় যেভাবে ছন্দ সম্পকে চিন্তনের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তাতে তাঁর ছান্দসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। আপন ক্ষমতা বলে তিনি হয়ে উঠেছেন 'ছন্দোগুরু'। আসলে রবীন্দ্রনাথ চিরজীবনই বিচিত্রের সন্ধান করে গেছেন, যা পেয়েছেন তাকে আঁকড়িয়ে থাকেননি। প্রকৃতপক্ষে নব নব রূপের সন্ধানই তিনি সারাজীবন ধরে করে গেছেন। কোনো প্রাচীন ছন্দোরীতিরই তিনি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেননি, সর্বদাই তাকে নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে গেছেন এবং সফলও হয়েছেন আপন ক্ষমতাবলে। তাই সব দিক দিয়ে বিচার করলে মনে হবে রবীন্দ্রনাথই বাংলা ছন্দের সার্থক ও মহান রূপকার। তিনি শুধু কবি নন, তিনি একজন সার্থক ছন্দোশিল্পী। তাই ছন্দ সম্পর্কিত তাঁর ভাবনা-চিন্তা, ব্যাখা-বিশ্লেষণ একালের কবিদের তো বটেই ভবিষ্যৎ কবিদেরও পাথেয় হয়ে থাকবে, একথা বলাই যায়।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছন্দ। বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪১৫, পৃ. ৪।
২. তদেব, পৃ. ৩১।
৩. তদেব, পৃ. ১৮৯।
৪. সেন, প্রবোধচন্দ্র। ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ। আনন্দ পাবলিশার্স, মে ২০১১, পৃ. ২৪।
৫. সেন, প্রবোধচন্দ্র। নূতন ছন্দ পরিক্রমা। আনন্দ পাবলিশার্স, অক্টোবর ২০১২, পৃ. ২৩৭।

৬. সেন, প্রবোধচন্দ্র। ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ। আনন্দ পাবলিশার্স, মে ২০১১, পৃ. ৪।

৭. তদেব, পৃ. ৪৩।

৮. তদেব, পৃ. ৪০।

৯. তদেব, পৃ. ৩।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. মুখোপাধ্যায়, অমূল্যধন। কবিগুরু (রবীন্দ্রকাব্যের মূলসূত্র)। দশহরা (২য় সংস্করণ), দে'জ পাবলিশিং, ১৩৭১, কলকাতা, ৭০০০৭৩।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দশম খণ্ড)। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ৯-ই মে-২০১১, কলকাতা, ৭০০০৭৩।

৩. সেন, নীলরতন। আধুনিক বাংলা ছন্দ (দ্বিতীয় পর্ব)। প্রথম দে'জ সংস্করণ, অক্টোবর-১৯৯৫, কলকাতা, ৭০০০৭৩।

৪. সেন, প্রবোধচন্দ্র। ছন্দ সোপান ও ছন্দ চর্চা চতুর্থ সংস্করণ। অণিমা প্রকাশনী, এপ্রিল ২০০৮, কলকাতা, ৭০০০০৯।

৫. সেন, প্রবোধচন্দ্র। ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, তৃতীয় মুদ্রণ। আনন্দ পাবলিশার্স, মে-২০১১, কলকাতা, ৭০০০০৯।

৬. সেন, প্রবোধচন্দ্র। নূতন ছন্দ পরিক্রমা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, অক্টোবর-২০১২, কলকাতা, ৭০০০০৯।

৭. কামিল্যা, মিহির চৌধুরী। বাংলা ছন্দ: রূপ ও রীতি, অষ্টাদশ সংস্করণ। সন্দীপ, ২০১২, কলকাতা, ৭০০০০৯।